প্রসাদ বৈষ্ণবীরূপে

প্রব্রাজিকা বেদরূপপ্রাণা
অধ্যক্ষা,
রামকৃষ্ণ সারদা মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন

ভারতবর্ষের অন্যতম শক্তিপীঠ বৈষ্ণোদেবী। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ মায়ের দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় ত্রিকূট পর্বতপথে বৈষ্ণোমাতার মন্দিরের উদ্দেশে যাত্রা করেন। স্থানীয় মানুষ গভীরভাবে বিশ্বাস করেন যে মা যাকে ডাকেন, কেবল সেই ভাগ্যবানই মাতৃদর্শনে ধন্য হতে পারে—তাঁর আহ্বান ছাড়া তাঁর কাছে পৌঁছনো যায় না। ২৯ জুন ২০২৫ আমাদের দেবীদর্শনের সৌভাগ্য হয়। নিশ্চয়ই তিনি চেয়েছিলেন, তিনি ডেকেছিলেন—তাই বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে মা বৈষ্ণোদেবীর কাছে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম।

যাত্রাপথে মাঝে মাঝেই কানে আসছিল ছোটবেলায় শোনা একটি পরিচিত গান—'তুনে মুঝে বুলায়া শেরাওয়ালিয়ে/ ম্যায় আয়া ম্যায় আয়া শেরাওয়ালিয়ে।' কী সুন্দর গানের ভাবটি। মা ডেকে পাঠিয়েছেন, আর সন্তান মার কাছে পৌঁছে সোচ্চারে জানাচ্ছে—'এসেছি মা গো, এসেছি আমি।' এক দিব্য গৌরবময় অনুভূতি জড়িয়ে আছে এই পথচলায়। স্বয়ং আদিশক্তি ডেকেছেন আমায়—আমি তাঁর সন্তান—আমি কি কম? যাত্রাপথে ধ্বনি ওঠে, 'বোল সাঁচে দরবার কি জয়', 'জোরসে বোলো জয় মাতাদি', 'প্রেম সে বোলো জয় মাতাদি'।

মায়ের দরবার যে সত্যের রাজপাট, তাঁর ভবন তো প্রেমের ভবন—আনন্দ নিকেতন!

জম্মুর কাটরা থেকে যাত্রা শুরু। যাত্রাপথের শুরুতেই 'দর্শনী দ্বার'। সিংহদরজাটি অতিক্রম করে মন্দিরগামী পাহাড়ি চলার পথের আরম্ভ, যদিও এখন সে-রাস্তা সুন্দরভাবে বাঁধানো, মাথার ওপর ছাউনি। এ-রাস্তায় পাহাড়িপথের রোমাঞ্চ নেই, তবে নিরাপত্তা আছে, স্বাচ্ছন্দ্য আছে।

যাত্রার শুরুতে বাণগঙ্গায় স্নান করেন অনেকে, তারপর চরণপাদুকা, অর্ধকুমারী—সবশেষে 'ভবন', মা বৈষ্ণোদেবীর বাসস্থান। প্রতিটি ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত কত কাহিনি, কত উপাখ্যান! তবে সবকটি লোকপ্রচলিত আখ্যানের সারবস্তু হল, দেবতা ও মানবের—ভক্ত ও ভগবানের মিলনগাথা।

অসুরকুলের গুরু শুক্রাচার্য তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দেওয়ার সময় দুঃখ করে বলতেন, ''তোমাদের বুদ্ধিতেই যত ভ্রম। ভ্রান্ত বুদ্ধি নিয়ে সব কাজে এগিয়ে যাও। এমনকী বুদ্ধি করে বরটাও চাইতে পার না। সেজন্য এত তপস্যা করেও তোমরা কোনও ফল পাও না কখনও।'' বারে বারে আসুরী শক্তির অভ্যুত্থান হয়। তারাও চেষ্টা করে, প্রাণপণ তপস্যা করে অভীষ্ট লাভের জন্য। তপস্যায় সিদ্ধ হওয়ার জন্য সাইনবোর্ড সহ বহু দানধ্যান, মন্দিরপ্রতিষ্ঠা, সমাজসেবায় অর্থদান—কত আপাত শুভকর্ম করে। কিন্তু মনের অন্ধকারে পুঞ্জীভূত হয়ে থাকা আসুরীবৃত্তি কখনই তাদের জীবনে শেষ সার্থকতা নিয়ে আসে না। ''দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।/ অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্।'' অহঙ্কার, অভিমান আর ক্রোধে মতিচ্ছন্ন এসব অসুর কখনই নিজের এবং জগতের কল্যাণ করতে পারে না।

পুরাকালে এরকমই এক অসুর, নাম তার দুর্গ, তপশ্চর্যা করে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করেছিল। অমরত্বের বর পাওয়া সম্ভব নয় জেনে সে বর চাইল—কোনও সাধারণ দেবদেবী তো নয়ই, এমনকী ত্রিদেব—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এবং ত্রিদেবী—মহাসরস্বতী-মহালক্ষ্মী-মহাকালীও যেন তার বিনাশ করতে না পারেন। শুক্রাচার্য ঠিকই বলেছিলেন—'ওরা চাহিতে জানে না দয়াময়'। দেবত্বকে, শুভকে অতিক্রম করে অশুভ কি কখনও জয়ী হতে পারে? দুর্গাসুর অসীম বলে নিজেকে বলীয়ান মনে করে স্বর্গরাজ্য অধিকার করে এবং নারকীয় দক্ষতায় স্বর্গকে নরক বানানোর কাজে উঠে পড়ে লেগে যায়।

জগৎপালক শ্রীবিষ্ণু জগতের রক্ষাকর্তা। জগৎ রক্ষায় প্রথম এগিয়ে এলেন তিনি। ঘোর যুদ্ধ হল নারায়ণের সঙ্গে দুর্গের। যতই দুর্বৃত্ত হোক না কেন, যে কারণেই হোক না কেন, সে যে নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য অন্য পথ অবলম্বন না করে ঈশ্বরকে ডেকেছে, ঈশ্বর তার মর্যাদা রাখবেন বই কি! নারায়ণ ব্রহ্মার বরে বলীয়ান দুর্গাসুরকে কিছুতেই পরাজিত করতে পারলেন না। ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নিতে এলেন ত্রিকূট পর্বতে। যখন পরমপুরুষ নিষ্ক্রিয় হন, তখন জেগে থাকেন একমাত্র পরমাপ্রকৃতি, পরাশক্তি। চিন্তিত ও শ্রান্ত বিষ্ণুর বিশ্রামস্থান সেই পর্বতে সেইসময়ে আবির্ভূতা হলেন ত্রিদেবী—মহাকালী, মহালক্ষ্মী এবং মহাসরস্বতী। ''ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি''—যখনই দানবের অত্যাচারে ধরণী পীড়িত হবে, তখনই সর্বশক্তিময়ী সর্বশক্তি নিয়ে আবির্ভূতা হবেন—এমনটাই অঙ্গীকার করেছিলেন দেবী শুম্ভ-নিশুম্ভ নিধনকালে। অঙ্গীকার রক্ষায় তিনি আবার অস্ত্র তুলে নেবেন। কিন্তু দুর্গাসুরকে তো বধ করতে পারবেন না ত্রিদেবীও—এমনটাই ছিল ব্রহ্মার বর। সেই বরকে অতিক্রম করে দুষ্টবিনাশের জন্য ত্রিদেবী মিশে এক হয়ে গেলেন, উৎপন্ন হল এক নিরাকারা মহাশক্তি। দানব–বিধ্বংসী সেই কল্যাণী শক্তি বধ করেছিলেন দুর্গাসুরকে। তারপর বিষ্ণুর অনুরোধে তিনি থেকে গেলেন ত্রিকূট পর্বতে। যেহেতু বিষ্ণুনারায়ণকে সাহায্য করতে তাঁর আবির্ভাব এবং বিষ্ণুরই অনুরোধে

জগৎকল্যাণে ত্রিকূট পর্বতে তাঁর স্থিতি—সেজন্য সেই শক্তি বৈষ্ণবী বা বৈষ্ণোদেবী নামে প্রসিদ্ধ হলেন। ত্রিদেবীর প্রতীক হিসাবে তিনটি প্রস্তরখণ্ডে তাঁর বিপুল শক্তি সংহত হয়ে রইল।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আমরা শুনেছি মহামায়া নিত্যা, এই জগৎ তাঁরই ছায়া। কিন্তু দেবতাদের কার্যসিদ্ধির জন্য তিনি বারে বারে আবির্ভূতা হন। গীতার বাণীরই প্রতিধ্বনি আমরা শুনি চণ্ডীতে। জগতে যখন দেবশক্তি অসুরশক্তির কাছে পরাভূত হয়, তখনই মহাশক্তি উৎপন্না হন। ত্রেতাযুগে আমরা ত্রিকূটবাসিনী বৈষ্ণোদেবীর মর্তে অবতরণলীলার একটি কাহিনি শুনতে পাই।

দক্ষিণভারতে এক মাতৃভক্ত দম্পতি ছিলেন—রত্নাকর ও সুমতি। তাঁরা দেবদ্বিজে ভক্তিমান, সত্যনিষ্ঠ, তবে নিঃসন্তান। তাঁরা সন্তান কামনায় বহুবছর পূজা, প্রার্থনা, উপবাস, যাগযজ্ঞাদিতে দিন কাটাতে থাকেন। তাঁদের ভক্তিতে প্রীত হয়ে একদিন মহাবিষ্ণু স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, স্বয়ং পরমাশক্তি তাঁদের ঘরে কন্যারূপে জন্ম নেবেন। তিনি মহাসরস্বতী-মহালক্ষ্মী-মহাকালীর সমন্বিত রূপ। ধর্মরক্ষার জন্য এবং জগতে ভক্তিভাব প্রচারের জন্য তিনি অবতীর্ণ হবেন।

কিছুদিনের মধ্যেই সুমতির কোল আলো করে এক জ্যোতির্ময়ী কন্যার জন্ম হল। বাবা-মা দেবীভক্ত হলেও কন্যা জন্ম থেকেই শ্রীনারায়ণের পূজা করতে ভালবাসেন। বাবা-মা তাঁর নাম দিলেন 'ত্রিকূটা'। ত্রিকূটা যত বড় হয় ততই তার তপস্যার কৃচ্ছ্রতা এবং ধ্যানের গভীরতা বেড়ে চলে। সমুদ্রের ধারে বসে তরঙ্গ গর্জনের মধ্যেই সে নিবিড় ধ্যানে ডুবে থাকে। দেবীপূজারি রত্নাকর ও সুমতি জানেন যে তাঁদের পুত্রীটি সামান্যা নন—ত্রিশক্তির সমাহার। তাই তাকে কোনও কাজেই তাঁরা বাধা দেন না।

সেইসময়ে বিষ্ণুর অবতার শ্রীরামচন্দ্র পত্নী সীতার খোঁজ করতে করতে এলেন সমুদ্রতীরে। দেখতে পেলেন সীতার অংশ ত্রিকূটা তাঁরই জন্য তপস্যায় বসেছেন। ত্রিকূটাও চিনতে পারেন মানবদেহধারী নারায়ণকে। চিরবরেণ্যকে আবার বরণ করে নিতে চান তিনি। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র যে একপত্নীব্রত ধারণ করেছেন! তাই তিনি বৈষ্ণবীকে স্বধাম ত্রিকূট পর্বতে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। সেখানেই তপস্যায় দেবী প্রস্তুত করবেন নিজেকে। কলিযুগে কল্কি অবতারলীলায় আবার তাঁরা মিলিত হবেন। রামচন্দ্র তাঁকে একটি ধনুক এবং তূণভরা অলৌকিক বাণ দিলেন।

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের আদেশ শিরোধার্য করে পিতামাতার অনুমতি নিয়ে ধনুর্বাণ হাতে দেবী চলে গেলেন তাঁর বাসস্থানে। সেখানে, নিরাকারা কৃপা করি, সাজিলে সুকন্যা নারী। নিরাকারা মহাশক্তি রত্নাকর-সুমতির কন্যা ত্রিকূটারূপে পর্বতগুহায় মহাতপস্যায় নিরত হলেন। মানুষ এবং ঈশ্বরের তপস্যার মধ্যে পার্থক্য আছে। দুর্বল মানবকুল করে ঊর্ধ্বায়নের তপস্যা আর দেবতার তপস্যা হয় অবতরণের। শুষ্ক হৃদয় নিয়ে ঊর্ধ্বমুখে অপেক্ষারত অগণিত নরনারীর জীবনে করুণাধারায় তিনি অবতরণ করেন। তপস্যায় ব্রহ্ম স্ফীত হন, আর তপস্যায় ব্রহ্মময়ী করুণাভারে আনত হন।

কেটে যায় ত্রেতা এবং দ্বাপর। আসে ঘোর কলির দুর্বহ সময়। অন্যায়ের ঘড়াগুলি একে একে পূর্ণ হয়ে চলেছে। রামচন্দ্রের নির্দেশ পালন করে জগজ্জননীর ধর্ম সংস্থাপন ও জগৎকল্যাণের সময় উপনীত হল।

সেসময় ত্রিকূট পর্বতের পাদদেশে, পর্বতেরই একস্থানে বাস করতেন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবার। ব্রাহ্মণের নাম শ্রীধর। শ্রীধর পরম দেবীভক্ত। তাঁরা

প্রতিবছর শারদীয়া নবরাত্রিতে নয়টি কন্যার পূজা করতেন। অনেক মানুষকে নিমন্ত্রণ করার সামর্থ্য ছিল না তাঁদের। কিন্তু আন্তরিকতা এবং ভক্তিভাবের ঘাটতি ছিল না। সন্তানহীন এই দম্পতি বছরের অন্যান্য সময় কেবল মহাদেবীর নামগুণকীর্তনেই সারাদিন অতিবাহিত করতেন।

পর্বতের নিচে যে জনবসতি, সেখানে এসেছেন গুরু গোরখনাথ বহু শিষ্যসঙ্গে। তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে জনপদবাসীরা সকলে দলে দলে তাঁর শিষ্যত্ব নিচ্ছে। কিন্তু গোরখনাথের মনস্কামনা পূরণের অলৌকিক আসরে কখনও শ্রীধর আসেননি। গোরখনাথের কানে আসে, গ্রামের এক ভক্ত ব্রাহ্মণ কোনওদিন কোনও বাসনাপূরণের জন্য তাঁর আশ্রয় নিতে চান না। কীসের জোরে দরিদ্র ব্রাহ্মণের এত স্পর্ধা! গোরখনাথ শ্রীধর প্রসঙ্গে কৌতূহলী হলেন।

ইদানিং শ্রীধরের বাড়িতে ফুটফুটে একটি ছোট মেয়ে প্রায়ই আসে। শ্রীধরপত্নীর হাতে হাতে কাজ করে দেয়, 'বাবা' 'বাবা' বলে শ্রীধরের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করে। খুবই মন কেড়ে নেওয়া কন্যাটি। কোন গ্রামে তার বাড়ি, বাবার নাম কী, কিছুই বলে না। শ্রীধরপত্নী তাকে নিজের সন্তানের মতনই ভালবাসেন। নবরাত্রির কিছুদিন আগে মেয়ে বায়না ধরল—"বাবা, এবারে তুমি সমস্ত গ্রামকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াবে? সবাইকে খবর দিয়ে আসি?" শ্রীধর তো অবাক, মেয়ে বলে কী? কোনওমতে শাকভাত খেয়ে দিন কাটে তাঁদের, এত গ্রামবাসীকে খাওয়ানোর সামর্থ্য কোথায়? মেয়ে নাছোড়বান্দা, কাঁদতে শুরু করল। শেষে শ্রীধরের স্ত্রী বলেন, "ছোট মেয়ে, ওর কথায় কি গুরুত্ব দিতে আছে? দুদিন পরেই সব ভুলে যাবে। বায়না করছে এত, তুমি রাজি হয়ে যাও।" কন্যাটির অশ্রুমুখী মুখ দেখতে ভাল লাগে না শ্রীধরেরও। শুধু বলেন, "মা, আমরা তো বড় দরিদ্র, তুই বুঝেশুনে নিমন্ত্রণ করিস। তোর বাপের যেন অসম্মান না হয়।"

আনন্দে নাচতে নাচতে বেরিয়ে যায় বালিকা। গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে গিয়ে বলে আসে, "নবরাত্রির অষ্টমীতিথিতে আমার বাবা নজন কুমারীর পূজা করবেন। তোমরা পূজা দেখতে এসো।" গ্রামবাসীরা জিজ্ঞাসা করে, "তোমার বাবা কে?" "শ্রীধর গো শ্রীধর।" শ্রীধরের মেয়ে আছে? গ্রামবাসীরা অবাক হয়। ছুটতে ছুটতে মেয়ে নামে পাহাড়তলিতে, যেখানে গুরু গোরখনাথ আছেন। বালিকারূপিণী বৈষ্ণবী গোরখনাথকে আমন্ত্রণ জানালেন।

গোরখনাথের শিষ্য ভৈরবনাথ মহাশক্তিশালী তান্ত্রিক। নিজের ক্রিয়াযোগক্ষমতার জন্য তাঁর অপরিসীম দম্ভ। তিনি তাচ্ছিল্যভরে বলেন, "তোমার পিতা তো কখনও আমার গুরুর কাছে নিচে নেমে আসেননি, আমরা কেন উপরে উঠব?" দেবী হাসেন, "মানুষকে তো উপরেই উঠতে হয়, সে নিচে নামবে কেন? নিচে নামেন একমাত্র অবতার।" গোরখনাথের যোগীদৃষ্টিতে যেন কোন অস্পষ্ট প্রকাশ ধরা পড়ে। তিনি শিষ্যদের বলেন নিমন্ত্রণরক্ষার জন্য শ্রীধরের বাড়ি যেতে। ভৈরবকে বলেন, "এই পাহাড়ে যুগ যুগ ধরে তপস্যা করছেন এক দেবমানবী। এই কন্যাটি কি সেই তপস্বিনী? তুমি তোমার যোগক্ষমতা বলে সেটাই আবিষ্কার করতে যাবে শ্রীধরের বাড়ি।" কোনও কোনও মতে, নিমন্ত্রণরক্ষায় স্বয়ং গুরু গোরখনাথ গিয়েছিলেন ব্রাহ্মণের বাড়ি।

নবরাত্রির অষ্টমী তিথিতে পূজা শুরু হতে চলেছে। হঠাৎ শ্রীধর দেখেন, একটি কন্যা কম। তিনি তো নজনকেই জানিয়ে এসেছিলেন, তারা

আসবে এমন আশ্বাস তাঁকে দিয়েছেন অভিভাবকেরা, তাহলে কিছু না জানিয়ে একটি মেয়ে অনুপস্থিত হল কীভাবে? বাবাকে চিন্তিত দেখে বালিকা দেবী এগিয়ে আসেন। "আমিই তো কুমারী বাবা, আমায় কুমারীপূজা করতে পার না?" সত্যিই তো, এই কুমারী কন্যার কথা তো তাঁর মনে হয়নি; কারণ এর পরিবার-পরিজন কোথায় এবং আদৌ মেয়েটি ব্রাহ্মণ কী না এ-প্রশ্ন বোধহয় তাঁর মনে ছিল। যাইহোক, সবরকম সংশয় দূরে সরিয়ে তিনি পূজা করতে বসলেন।

পূজা থেকে উঠে দেখেন ইতোমধ্যে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে বাড়ির উঠোন। এ-মেয়ে করেছে কী? কী খেতে দেবেন তিনি এত মানুষকে? মনে মনে কাতরভাবে দেবীর কাছে প্রার্থনা করতে শুরু করলেন। সেসময় হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল, সদলবলে তাঁর বাড়ির দিকে আসছেন গোরখনাথের শিষ্য সম্প্রদায়। এবারে সত্যিই ভয় পেলেন শ্রীধর। গোরখনাথের শিষ্যরা তান্ত্রিকক্রিয়াতে পারদর্শী। ক্রুদ্ধ হয়ে যদি অভিশাপ দেয়? শ্রীধর তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন।

এদিকে ঘরের বাইরে এক অপরূপ দৃশ্য! গ্রামবাসীরা সার দিয়ে পংক্তিতে বসে পরম তৃপ্তিতে আহার করছে। এমন সুস্বাদু প্রসাদ তারা আগে কখনও খায়নি। যেন দশভুজা হয়ে পরিবেশন করছেন বালিকারূপিণী দেবী। অহঙ্কারী ভৈরবনাথ, যিনি এসেছিলেন গোরখনাথের আরও অনেক শিষ্যের সঙ্গে শ্রীধরকে অপদস্থ করার জন্য, বালিকার সঠিক পরিচয় জানার জন্য—পূজা ও আহারের এমন সুচারু আয়োজন দেখে তিনি ক্রোধে জ্বলে ওঠেন। এই মেয়েটিই কোনও যোগশক্তিতে এমন আয়োজন করেছে। এতবড় স্পর্ধা! গোরখনাথ ও তার শিষ্যদের রাজত্বে বাস করে নিজের যোগবিভূতি দেখানোর সাহস দেখাচ্ছে মেয়েটি! একে উচিত শিক্ষা দিতে হবে। 'ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ, সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।' ভৈরব ভুলে গেলেন অষ্টাঙ্গ যোগসাধনার প্রথম সোপান 'অহিংসা'। আসুরীভাবে উন্মত্ত ভৈরব আক্রমণ করতে গেলেন দেবীকে।

বায়ুবেগে ছুটে চললেন বৈষ্ণবী দেবী। ছুটতে ছুটতে এসে পৌঁছলেন পাহাড়ের পাদমূলে। সেখানে এক পাথরে বসে আছেন রামভক্ত হনুমান। দুজনেই দুজনকে চিনতে পারেন। দেবী বলেন, ''হনুমান একটু জল খাওয়াবে?'' হনুমান বলেন, "মাগো একবার দ্বাপরযুগের সীতারূপে দেখা দেবে?" হাসেন বৈষ্ণবী—পুত্রকে সীতামায়ের রূপে দর্শন দিয়ে নিজেই হাতে তুলে নেন রামের দেওয়া ধনুর্বাণ। বাণের আঘাতে পাথর চিরে গঙ্গা বইতে শুরু করে। মাতাপুত্র দুজনেই সেই বাণগঙ্গার জল খেয়ে তৃপ্ত হলেন। শ্রান্ত বৈষ্ণবী দেবী, শীতল গঙ্গাজলে নিজের কেশ ধুয়ে নিলেন। সেজন্য এই বাণগঙ্গার আর একটি নাম 'বালগঙ্গা'।

ইতোমধ্যে ভৈরব চলে এসেছেন কাছাকাছি। আবার বিদ্যুৎগতিতে ছুটে চললেন দেবী। একবার মাঝপথে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে দেখলেন ভৈরব কতদূরে। সেই স্থানটিতে পাথরের ওপর নিজের চরণচিহ্নদুটি রেখে যান দেবী। যাত্রাপথের এই স্থানটি বর্তমানে চরণপাদুকা নামে খ্যাত।

ছুটে চলেন দেবী অর্ধকুমারীর দিকে। জায়গাটির সঠিক নাম আদকুয়ারী বা আদি কুমারী। তপস্বিনী চিরকুমারী ত্রিকূটা দেবী আদকুয়ারীর এক সঙ্কীর্ণ গুহায় ঢুকে গেলেন। বাইরে পাহারায় রইলেন হনুমান। ধ্যানপ্রবণ আত্মচেতনায় লীন মনটি তাঁর আবার ডুবে গেল অন্তর্লোকে। সেই গুহায় নটি মাস তপস্যা করে

জ্যোতির্ময়ী প্রবল শক্তিতে আত্মপ্রকাশ করেন। গুহাটিকে গর্ভজূন বলা হয়। খুব কষ্ট করে, প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে গুহাটি পার হন ভক্তরা। এভাবে পথটি অতিক্রম করার একটি প্রতীকী তাৎপর্য আছে। ভক্ত যেন বলছেন, "করমডোর নাশো গো মোর, গর্ভযাতনা দিও না আমায়।"

ছুটে চলেছেন দেবী সেই স্থানটির দিকে, যেখানে একসময় তিনি নিরাকারা চৈতন্যস্বরূপে প্রকাশিত হয়েছিলেন, যেখানে ত্রিদেবীর সম্মিলনে এখনও বিচ্ছুরিত হচ্ছে মহাশক্তি। সেখানে পৌঁছেই বদলে গেল তাঁর রূপ। ভয়ঙ্করী মহাকালীরূপ ধারণ করে ভৈরবের শিরচ্ছেদ করলেন তিনি।

এতক্ষণে ভৈরবের দানবীয় বৃত্তি স্তিমিত হয়েছে। তিনিও তো এককালে দেবীর আরাধনা করতে শুরু করেছিলেন। তাঁর সাধনজীবনের শুরুতেও তো আছে কত ত্যাগতপস্যা। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যে বলেছেন, তাঁর ভক্তের কখনও বিনাশ হয় না! ভৈরবের মস্তক ইষ্টদেবীর পদতলে আছড়ে পড়ল, কিন্তু তাঁর প্রাণ গেল না। 'দুর্বৃত্তবৃত্তশমনং তব দেবি শীলং'—দুর্বৃত্তের দুর্বৃত্তি দূর করেছেন দেবী। সন্তানকে ধুলোকাদা ঝেড়ে ধুয়েমুছে নিয়েই মাতৃস্বভাবে বলে উঠলেন, "কী চাই বাবা তোমার?" ভক্তভৈরব প্রার্থনা করলেন, "আমার অহঙ্কারী এই কর্তিত মাথাটিকে বিছিয়ে দিও ত্রিকূট পর্বতের পাদমূলে, যেখান থেকে ভক্তরা তোমার দর্শনের জন্য যাত্রা শুরু করবে। তারা সবাই আমার মাথা পা দিয়ে মাড়িয়ে তোমার কাছে যাবে, আর তাতেই আমার বহুজন্মের পাপ বিনষ্ট হবে।" ভৈরবের কাটা মাথা কোথাও বিছিয়ে আছে বলেই বৈষ্ণোদেবীর যাত্রারম্ভের শহরটির নাম কাটরা। দেবী বললেন, "আর একটি বর চাও।" ভৈরব আর কখনও মায়ের সঙ্গছাড়া হতে চান না, তাই প্রার্থনা করলেন, "তুমি যে-গুহায় থাকবে, সেখানে আমার মস্তকবিহীন শরীরটিরও স্থান দিও। আর এই বর দাও যে তোমার কাছে যে যা প্রার্থনা নিয়ে আসবে, তাকে যেন শূন্যহাতে ফিরে যেতে না হয়।" মা বললেন, "শুদ্ধমন নিয়ে এসে যদি কেউ আমার কাছে প্রার্থনা করে, তাহলে আমি তার মনস্কামনা পূর্ণ করব।" এবারে তিনি নিজেই তৃতীয় বরটি দিলেন ভক্তকে। বললেন, "এতক্ষণ তো তুমি শুধু লোককল্যাণের জন্য বর চাইলে। আমি তোমায় বলছি, তুমি থাকবে আমার মাথার ওপরে। ভৈরবের স্থানটির নাম হবে ভৈরোঘাঁটি। আর তোমায় দর্শন না করা পর্যন্ত ভক্তদের বৈষ্ণোদেবী যাত্রা সম্পূর্ণ হবে না।"

যে-দেবী একসময় তপস্যায় লীন হয়েছিলেন, নিরবয়বে গোপন ছিলেন শুদ্ধচৈতন্যে, বিশ্বপ্রকৃতিতে—সেই পরমাপ্রকৃতি এখন করুণায় অবতরণ করেছেন দুঃখতাপিত মানুষদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য। তিনি দুহাত বাড়িয়ে অপেক্ষা করে থাকেন ভক্তদের জন্য। তাঁদের ডেকে চলেন।

যুগে যুগে ঈশ্বর-ঈশ্বরী একই লীলা করেন। ১২৮০ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে ফলহারিণী কালীপূজার রাত্রে, দক্ষিণেশ্বরতীর্থে, বিষ্ণুভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ত্রিদেবীর সমন্বিত রূপ এক মহাশক্তিকে জাগ্রত করেছিলেন। নহবতের গোপন কক্ষে তপস্যায় তপস্যায় সেই শক্তিও নিজেকে প্রস্তুত করেন। তারপর যথাসময়ে করুণাধারায় দুকূল প্লাবিত করে আত্মপ্রকাশ করে চলেন। দেবী বৈষ্ণবী এবং দেবী সারদা—অবতরণলীলায় একই নাটিকার পুনরভিনয় চলে। দুহাত উজাড় করে মা তো দিতেই ব্যাকুল, শুধু আমাদের গ্রহণ করার মনটিকে প্রস্তুত করতে হবে। ডেকে চলেছেন তিনি। যুগযুগান্তর ধরে সন্তানকে ডেকে চলেছেন দেবী বৈষ্ণবী, দেবী সারদা। সে-ডাক শোনার জন্য আমাদের আপন হৃদয়গহনদ্বারে বারে বারে কান পাততে হবে যে!